বাংলায় শিল্পচর্চা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিষ্ণু দে

এক হিসাবে চিত্রশিল্পের সংবেদন মার্গে যে শুদ্ধির অবকাশ, তাতেই সাধারণ মানুষের আবেগ সহজে জাগে এবং সে আবেগের কথা বলতে গিয়ে তাকে প্রথাসিদ্ধ শিল্প সমালোচক সাজতে হয় না। বাঙালী শিল্পীর রচনা এক হিসাবে এ দেশের নবজাগরণে, যাকে বলে জাতীয় রেনেসাঁস— এ সক্রিয়তার একটি দিক। যে সাধারণ্যে রুচি মূর্তি নিচ্ছে, সেই জনরুচির মানেই তাই এক্ষেত্রে কান্তিবিদ্যার মানদণ্ড প্রয়োগ সম্ভব। ভাষাবহ শিল্পেও অবশ্য ছন্দের প্রাথমিক অঙ্গীকার আছে, এবং ছন্দ মূলত শুদ্ধ সন্দেহ নেই, নৃত্যের শারীরিকতা ও সামাজিকতাতেই ছন্দের বংশনির্দেশ। কিন্তু বংশপরিচয়ে পুরুষার্থ সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাথমিক ছন্দের প্রত্যক্ষ আবেগ আমরা দীর্ঘকাল হল হারিয়েছি সভ্যতার প্রগতির অনিবার্য কারণে, যেমন শ্রুতির মিথ্ বদলেছে স্মৃতির পুরাণে, প্রতীক বদলেছে ব্যক্তিগত কল্পপ্রতিমায়। ভাষার বহুধাব্যবহার ও সামাজিক ক্রমচ্ছেদের গতি সভ্যতার সঙ্গে সমানতালেই চলেছে। কিন্তু একদিকে সংগীত আর অন্যদিকে দৃশ্যশিল্পে এখনও বিভিন্ন আবেদনের পরিচ্ছন্নতা খানিকটা বর্তমান। রং এখনও কৃষি বা যন্ত্র বা মসীজীবীর জীবনবোধের বৃদ্ধি সাধন করে, রূপাকার এখনও আমাদের স্পর্শাবেগে সম্পূর্ণতা আনে, শেষ পর্যন্ত আমাদের পেশলত্বের তারে মোচড় দেয়।

এই আবেগে ধরা দেয় বস্তুর অধরা সত্তা, শিল্পীর চৈতন্যে এবং শিল্পের মাধ্যমে চারিয়ে রূপান্তরে। শিল্পীমানসের আততিতে, তাঁর প্রকাশের তাগিদের বিচারেই তাঁর বাস্তব উপলব্ধির সততার বিচার। আমাদের শিল্প-রেনেসাঁন্সের ইতিহাস এ বিচার ছাড়া বোধ্য নয়। এ বিচারেই অবনীন্দ্রনাথের সূত্রপাত ঐতিহাসিক সার্থকতা পায়, এ বিচারেই সেই দারা পরিণতি পায় যামিনী রায়ের পাকা তুলিতে এবং তারই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা দেখতে পাই তরুণ শিল্পীদের কাজে, গোপাল ঘোষ, নীরদ মজুমদার, রথীন্দ্র মৈত্র, প্রাণকৃষ্ণ পাল চিত্তপ্রসাদ, তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের শিল্পচেষ্টায়।

প্রথমেই নমস্য তাই অবনীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর গভীর শিল্পস্বভাবে আর সেই শুদ্ধ

কারণে বাংলার লৌকিকজীবনের সঙ্গে দুর্মর সাযুজ্যে বুঝেছিলেন কোথায় বাংলার নবজাগরণের উৎস। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব, সমাজসংস্কার, ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন ইত্যাদি যে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সত্য নয়, সে বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথই প্রথমে আমাদের সচেতন করেন, পালটা গোঁড়ামির বাঁধি গতে নয়, সৃষ্টিময় শিল্পচৈতন্যেরই সার্থক এষণায়।

এ কাজে তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী হ্যাভেলের ভাষায় পথ নির্দেশ এই

'Present methods od education have opened a rift between the artistic castes and the 'educated' such as never existed in any previous time in Indian history. The remedy lies, not in making Indian artists more literate in the European sense... nor in manufacturing regulation pattern books but in making the 'literate, educators and educated conscious of the deficiencies of their own education...

সম্প্রতি ইংরেজ সমালোচক এলিক ওয়েস্ট এক প্রবন্ধে (মডার্ন কোয়ার্টরলি—মার্কসিস্‌ম ও কালচার) ভারতবর্ষে এখনো অবশিষ্ট এই লোকশিল্পের স্থান আলোচনায় প্রায় এই প্রশ্নই তুলেছেন, তিনিও মনে করেন যে আমাদের শিল্প ভবিষ্যৎ খানিকটা স্বচ্ছ, কারণ ঐ তথাকথিত ইওরোপীয় শিক্ষার যে অ্যাকাডেমিক বা মাছিমারা বস্তুতান্ত্রিকতার বন্ধন সেটা এখনও আমাদের জনসাধারণের রুচি একেবারে নষ্ট করে নি। কথাটা পুরানো বা নতুন কোনো রেগুলেশন কপিবুক তৈরি ও চালু করার আগে সবার পক্ষে, মার্কসিস্টেরও পক্ষে স্মর্তব্য। বলাই বাহুল্য, ভবিষ্যৎ রচনা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ ঐ হ্যাভেলোক্ত 'শিক্ষিত' ও ইংরেজিহীন শিল্পকর্তা জনসাধারণের মধ্যে ভেদটা নগণ্য নয়, এমনকি চিত্র বা গঠনমূলক শিল্পাদিতেও, যদিও ভেদটা সাহিত্যেই বেশি প্রকট ভাষাগত কারণে। ভেদের জোড় লাগবে অবশ্যই বৃহত্তর সমাধানে, নিছক শিল্পক্ষেত্রেই যে চেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকবে না। হ্যাভেল তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতির অগাধ জ্ঞান ও শ্রদ্ধা নিয়েও একথা ঠিক বোঝেননি, যদিও মার্কসের ভারতীয় পত্রাবলীতে এর নিশানা মেলে। হ্যাভেল তাই সামাজিক জীবনের সমগ্রতার ঘোড়ার মুখে জুততে চান শিক্ষার আংশিক সমাধানের গরুর গাড়ি।

কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের দান কতখানি হতে পারে আমাদের জাতীয় জীবনের নবজাগরণে সে বিষয়ে হ্যাভেল প্রায় এলিক ওয়েস্টের মতোই দৃষ্টিবান—

...behind all this intellectual and administrative chaos there remain in India a native Living tradition of art, deprooted in the

ancient culture of Hinduism, richer and more full of strength than all the eclectic learning of the modern academies and artguilds of Europe...

এর থেকে যদি ঐতিহ্যধারায় মানুষ অনাত্মচেতন কারুশিল্পী, অভ্যাসিক যাঁর কর্মপদ্ধতি এবং যাঁর দ্বিতীয় মন বিশেষ কিছু স্বীয় কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না তাঁর সঙ্গে, যে শিল্পীর কাজ মোটামুটি তাঁর মানসের সমগ্রতায় সচেতন কর্ম, সে শিল্পীকে এক করে ফেলি তাহলে আজ সেটা মারাত্মক ভুল, প্রতিক্রিয়াশীলতা বা অতীত সর্বস্বতারই নামান্তর। তার অর্থ এ নয় যে আমাদের লোকশিল্প যে বছরে বছরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা শিল্পীরা ভিক্ষায় বা অকাজে নামছেন, সে বিষয়ে কিছু কর্তব্য নেই। কিন্তু অতীতকে জীয়ানো যায় না, ইতিহাসকে এড়িয়ে কিছু শৌখিন বাড়ি সাজানোর জিনিস হয়তো পাওয়া যায়, আর্টিস্ট পাওয়া যায় না। ঐতিহ্যগত লোকশিল্পে শিল্পীর কোনো বিকাশ বা বিবর্তন নেই।

আসলে হ্যাভেলও কার্যত তা জানতেন, নাহলে তিনি কি করে অবনীন্দ্রনাথের সাহায্যে শিল্পশিক্ষার সরকারি স্কুল চালালেন শিল্পীর সম্ভাবনা ভেবেই, প্রথাসিদ্ধ তথাকথিত ভারতীয় কারুশিল্পী তৈরি করতে নয়।

শিল্প ও কারুকারের ঐক্যসাধনে প্রশ্ন এখানে উঠছে না, যদিচ উভয়ের সুস্থ সম্বন্ধপাত এবং একই ব্যক্তির মধ্যে শিল্পী ও কারুকারের ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আধুনিক শিল্পের কিছুটা নিরক্তুতা, কিছুটা টেকনিকগত দুর্বলতা নিশ্চয়ই এই ঐক্যের অভাবে। কিন্তু শিল্পীর পক্ষে আজ সজ্ঞান নির্বাচন অনিবার্য। আমাদের এই প্রাচীন চিরাচরিত মহাদেশেও জীবনের রূপ বদলেছে এবং এই প্রতিযোগিতার যুগে পণ্যের যুগে মানুষ তার মানসকর্মে বৃত্তিনির্ভর ধারাবাহিক স্বাক্ষরহীনতা হারিয়েছে, যেমন শক্তি লাভ করেছে ব্যক্তিস্বরূপের সাধারণ ঐশ্বর্যে, আত্মচেতনায়, প্রত্যক্ষ নির্বাচনের নির্বিশেষ ক্ষমতায়— সর্বদা না হলেও অন্তত নির্বাচনের সম্ভাবনায়। অবনীন্দ্রনাথ সে নির্বাচন করেছিলেন, তিনি ইওরোপীয় যাথার্থ্যমার্গে ওস্তাদ হতে পারতেন, বড় প্রতিচিত্রকর হতে পারতেন, মহত্তর রবিবর্মা হতে তো পারতেনই। কিন্তু তিনি স্পষ্টই হলেন ভারতীয় শিল্পের রেনেসাঁন্সের নেতা।

এটা প্রাদেশিকতা নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির জগতে প্রায় অপাংক্তেয় বাংলায় যে কেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কারবার পাতল, তার কারণ অবশ্যই কোনো জাতি-তত্ত্বে খোঁজবার দরকার নেই। সূত্রপাতে এবং সাংস্কৃতিক পক্ষপাতে অনার্য, ব্রাহ্মণের সবচেয়ে দুর্বল ঘাঁটি, দিল্লী থেকে বারাণসী কাঞ্চী থেকে দূরে বাংলার কিন্তু ছিল স্বকীয় সমস্যা ও সমাধান চেষ্টা— জীবনেরই মতো, লৌকিক শিল্পসংস্কৃতির

ক্ষেত্রেও এবং বাংলাতেই গজাল ও বিকাশ পেল প্রথম ভারতীয় মধ্যবিত্ত, চাকুরিয়া, নব্যশিক্ষিত, সংস্কারক, প্রতিসংস্কারক, ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব থেকে জাতীয় ভারতের স্বপ্নের রাত অবধি।

অবনীন্দ্রনাথের সত্তার শিকড় এই বাংলার আদিম গভীরে। অবশ্যই তিনি নবাবী আমেজ পেয়েছিলেন, ব্রিটিশপূর্ব ও প্রাক্-ব্রিটিশ দরবারী সংস্কৃতি তাঁরও স্মৃতিতে সঞ্চারিত এবং মুঘল তস্‌বিরের বিলাসী সৌকুমার্য, রাজপুত চিত্রের গীতায়িত আবেগ, জাপানী ছবির সুক্ষ্ম পেলবতা ও ওয়াশ্ টেকনিক তাই তাঁর আয়ত্তে এল অত সহজে।

কিন্তু এও বাহ্য। প্রথম উৎসাহে এবং খানিকটা তখনকার ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের দরুন তাঁর হ্যাভেল কুমারস্বামী প্রমুখ বন্ধু ও ভক্তরা এবং ছাত্ররা অবনীন্দ্রনাথের স্বভাব ও কাজের আরেক দিক, স্থায়িতর দিকটা গৌণ ভাবেন। তাঁর প্রতিভার সেদিক দেখি তাঁর বাংলার নিসর্গ-দৃশ্যমালায়, চণ্ডী ও কৃষ্ণলীলার চিত্রে, ঠাকুমা শিশু ইত্যাদি ঘরোয়া ছবিতে। তাঁর প্রতিভার এই দিক থেকেই তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠতম লেখকও বটে।গল্পের বইতে তাঁর মজাদার নাটকে, ছড়ায় অবনীন্দ্রনাথের মধ্যে গ্রামীণ বাংলার সংস্কৃতি নব স্বরূপ খুঁজে পায়। আমাদের ছড়া, গান, কথকতা, রূপকথা, মেয়েলি ব্রতে বাংলার প্রত্যক্ষ নিসর্গে তাঁর প্রতিভা ভূতপত্‌রী ও ক্ষীরের পুতুল গড়ে হাঁসের ঝাঁকে বাংলাময় ওড়ে, কুঁকড়োর গানে জাগে। আমাদের অজাতমৃতমূর্খপ্রায় সংস্কৃতিতত্ত্বে ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় তার বাংলার ব্রত প্রাথমিক বই। গমনাগমন-এর শিল্পপ্রতিভা শুধু রচনায় নয়, শিল্পবিচারের অন্তর্দৃষ্টিতেও অসামান্য। আমাদের নদীমাতৃক মাটির যে সংস্কৃতেতর লৌকিক সরস প্রত্যক্ষধর্মী মানবিক সংস্কৃতি, দ্বারকা ঠাকুরের গলির পাঁচ নম্বরের শৈশবার্জিত তার জ্ঞান ও জীবনবোধই তাঁর মুখ্য দান, যার স্বীকৃতি ভবিষ্যতে বিস্তৃত।

নিজবাসভূমে পরবাসী সে যুগে অবনীন্দ্রনাথের এই আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎ নির্ণয় অর্থাৎ নবজাগ্রত আন্দোলনের ঐতিহাসিক মর্যাদা কতখানি তা বোঝা যায় চিত্রের মাধ্যমের বাইরে এই আন্দোলনের খতিয়ানে বিশেষ করে ভাষাবহ কর্মক্ষেত্রে, যথা সাহিত্যে। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টির অভাবেই বোধহয় আজও ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতির বিচারে এই ব্রহ্মণ্যহীন লোকায়ত পক্ষপাত প্রায় দুর্লভ— একদিক থেকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন এবং ক্ষিতিমোহন সেনের কোনো কোনো লেখা ছাড়া। এ তির্যক ইংরেজপক্ষপাতের জন্যেই বোধহয় সাহিত্যবাদী সাহিত্যিকও আপন অজ্ঞাতে অবনীন্দ্রনাথের ভাষারচনার অসামান্য সাহিত্যমূল্য— কি শিল্প মর্যাদায় কি বৈচিত্র্যে, নির্ধারণে দুর্দান্তরকম কার্পণ্য করেন। শিল্পবিচার বা কান্তিবিদ্যার চর্চাতেও

অবনীন্দ্রনাথের লেখা সংখ্যায় বা গৌরবে কম নয়।

অথচ ব্যাপারটা তুচ্ছ নয়, কারণ এ স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িত যে শুধু মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বর গুপ্ত, মাইকেল, দীনবন্ধু এমনকি তারাশঙ্করের বিচার কিংবা পট বা পাটের আলোচনা তা নয়, এরই সঙ্গে জড়িত আমাদের ইতিহাসের পাঠোদ্ধার, আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের রূপায়ণ। রামমোহনের দেশ, বঙ্কিমের দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ আরো অনেকেরই তো দেশ; তাছাড়া তার অতীত বাদ দিয়ে কি শুধু উকিল মোক্তারে মাস্টারে কেরানিতেই তার বর্তমান নিঃশেষ? তার ভবিষ্যৎ কর্মসূচি কি শুধু দিল্লীতেই ফুরিয়ে যায়? এবং যদি ভাবা যায় যে এটা অবনীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাহলে ভুলই হবে। কারণ যদিও অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার বহুধা বৈচিত্র্য আরেক দেশের বৃহত্তর ও মৌলিক রেনেসাঁন্সের কথা মনে আনে— দ্য ভিঞ্চি বা বেলিনির যুগের কথা, তবু তাঁদেরই মতো অবনীন্দ্রনাথও তাঁর কালেরই মানুষ, অর্থাৎ একা নন।

গগনেন্দ্রনাথের মধ্যেও বাংলার জীবন ও জনসংস্কৃতির সঙ্গে এই যোগাযোগেরই আর এক প্রকাশ। ভারতীতে এবং বিশেষ করে 'জীবন-স্মৃতি'র সহজ কিন্তু মনোরম ব্যঞ্জনাময় চিত্রাবলীতেই তাঁর বিলম্বিত আত্মপ্রকাশ। তারপরে বৈষ্ণব ভাবধারায় তাঁর ঐশ্বর্য বিস্তারের অধ্যায়। কিন্তু সে অধ্যায়েই তাঁর হাত ক্ষান্তি মানে নি, এল প্রখর সমাজবেদনাহত ব্যঙ্গচিত্রাবলী এবং যেন একজন শিল্পীর পক্ষে এই যথেষ্ট কীর্তি নয়, গগনেন্দ্রনাথ শুরু করলেন তাঁর তথাকথিত ঘনকাব্য যুগ, ভাস্বর কোণমিতির সাক্ষাৎ কাব্য। আর্টিস্ট যে কি সম্পূর্ণতায় স্বকীয় সীমাবদ্ধতার সদ্ব্যবহার করতে পারেন, গগনেন্দ্রনাথের চিত্রাবলী তার আশ্চর্য উদাহরণ।

তারপরে আরেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথ যখন দুহাতে দিলেন উড়িয়ে নব্যভারতীয় ভাববিলাস আর অ্যাকাডেমির যথাযথবাদের দাবি। আমাদের কালের সবচেয়ে প্রচণ্ড মনের উলঙ্গ স্বপ্ন, অফুরন্ত কল্পনা রেখার রঙের অজস্র কিন্তু নিশ্চিত ছন্দে ভাসিয়ে দিলে অশিক্ষিত পটুত্বের পুথিগত দ্বিধা, যেমন ভেঙে দিলে রবীন্দ্রনাথেরই বিরাট সাহিত্যকীর্তি-লালিত তাঁর শুচিবায়ুগ্রস্ততার, শালীননীতির পুরাণ।

আরেকজন মহৎ শিল্পীর কাজেও এই দ্বৈততার আভাস দেকা যায়, নন্দলাল বসুর বিরাট চিত্রকর্মে। নন্দলালের রূপায়ণে অন্তহীন নব নব বিকাশ তার নানা রীতির অন্বেষা যে-কোনো শিল্পগোষ্ঠীর গর্বের বিষয়। দীর্ঘ কীর্তির পটে আজও তাঁর কল্পনার সাবেক ঐশ্বর্য কমে নি, অধিকন্তু এই কথাই বলা উচিত যে তাঁর মানস সম্পদের প্রাচুর্যেই তাঁকে তাঁর রেখার ও রঙের অমিতৈশ্বর্যের সাততলা মহলে বারবার নিয়ে

যায় রূপের শুদ্ধ মাটি থেকে। নন্দলালের পোস্টারচিত্রে অবশ্য লোকশিল্পের ব্যবহার দ্রষ্টব্য, যেমন তাঁর বাংলার গ্রাম্যজীবন ও নিসর্গের অজস্র চিত্রাবলীতেও তা দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে আমাদের নতুন শিল্পান্দোলনে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে প্রদোষ দাশগুপ্তের মতো শিল্পী থাকা সত্ত্বেও চিত্রের অনুরূপ কিছুই বিশেষ কাজ হয় নি। স্থাপত্য তো বটেই এমনকি ভাস্কর্যের প্রসারে সামাজিক সমর্থন আশু প্রয়োজন। আমাদের জীবনযাত্রায়, জীবনের প্রত্যেক স্বচ্ছ উপভোগে কোথায় সে সমর্থন? সে অবাবেই বোধহয় চিত্রকলাতেও এত মৌল রূপ-ভাবনায় শৈথিল্য, কোনো ব্যক্তিগত ত্রুটির চেয়ে বেশি এই ঐতিহাসিক কারণেই।

এইদিক থেকেই যামিনী রায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। তাঁরই মধ্যে আচার্য অবনীন্দ্রনাথের স্বপ্ন, তাঁর বন্ধু নন্দলালের সাধ সম্পূর্ণ। তাঁর কাজে আমাদের শিল্প রেনেসাঁন্সের পটে বাংলার স্বকীয় সমগ্রতালাভ। এদিকে তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ অ্যাকাডেমিক বা বস্তুতান্ত্রিক রীতির পাকা চিত্রকর, অসামান্য রেখা শিল্পী, আবার বাংলার লোকমানসে ও শিল্পে তার গভীর সাযুজ্য। তাঁর প্রথম যুগের অনলস কঠিন সিদ্ধির মধ্যে তাঁর যে শিল্পমানসের বিপ্লব এল, তার দীর্ঘ ও বিস্ময়কর বিবর্তনের ইতিহাসে, গ্রহণে ও বিচারেই আমাদের শিল্পের ভাবী সম্ভাবনা।